ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কার্যকর নির্বাচন কমিশন:
অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩

কার্যকর নির্বাচন কমিশন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
সাধন কুমার দাস, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা সহযোগী
রবিউল ইসলাম, *অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, **রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি***

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য রবিউল ইসলাম ও শাম্মী লায়লা ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞতা। প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার জুলিয়েট রোজেটি, শাম্মী লায়লা ইসলাম, অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফাতেমা আফরোজ, এবং প্রতিবেদনের ওপর মন্তব্যের জন্য রুমানা শারমিনসহ অন্যান্য সহকর্মীদের অশেষ ধন্যবাদ। এছাড়াও সকল উত্তরদাতার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

কার্যকর নির্বাচন কমিশনঃ অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

সার-সংক্ষেপ

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সকলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পন্ন করা অপরিহার্য, যেখানে নির্বাচন কমিশনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা, প্রেসিডেন্ট, সংসদীয় ও অন্যান্য নির্বাচন পরিচালনা করা, এবং সংসদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংসদীয় এলাকা নির্ধারণ করা।[১] এসব দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য আরও কিছু দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে পালন করতে হয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে টিআইবি ২০০৬ সালে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ গবেষণা প্রকাশের পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশনে উল্লেখযোগ্য নির্বাচনী ও প্রাতিষ্ঠানিক আইনি সংস্কার সাধিত হয়। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ (২০০৯), রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা (২০০৯), এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নে তৃণমূলের অংশগ্রহণ (২০১০)। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওপর বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী ও প্রাতিষ্ঠানিক আইনের পর্যালোচনা করা;
- নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;
- নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিশ্লেষণ করা;
- নির্বাচন কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা; এবং
- নির্বাচন কমিশনের ভবিষ্যৎ করণীয় সুপারিশ করা।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্যের বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত। গবেষণার আওতাভুক্ত বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরোক্ষ তথ্য পর্যালোচনা। মুখ্য তথ্যদাতাদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রধান ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের ঢাকা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি, বিভিন্ন নির্বাচনের প্রার্থী ও তাদের প্রতিনিধি, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, সংবাদ-মাধ্যম কর্মী, ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি। সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে দলীয় আলোচনা করা হয়। এছাড়া গবেষণা দলের পক্ষ থেকে চারটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন ও একটি পৌরসভা মেয়র নির্বাচনের সময়ে মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পরোক্ষ তথ্য উৎসের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানসহ নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, বই, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত নথি এবং সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিষয়-সংশ্লিষ্ট সংবাদ ও বিশ্লেষণ।

এ গবেষণার সময়কাল ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত। গবেষণার জন্য ২০১১ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২. গবেষণার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

২.১ নির্বাচনী ও প্রাতিষ্ঠানিক আইনের সংস্কার পর্যালোচনা

২০০৭ সালে পুনর্গঠিত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন কমিশন বেশ কিছু আইনি সংস্কারের উদ্যোগ নেয়, যার মধ্যে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্যতার শর্ত বৃদ্ধি করা, প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা, রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ নির্দিষ্ট করা, জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা,

---

* ২০১৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

[১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১১৯।

নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী কেন্দ্র পরিবর্তন ও প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা প্রদান, একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ পাঁচটি আসন থেকে কমিয়ে সর্বোচ্চ তিনটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেওয়া, নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা পুনর্নির্ধারণ করা, আচরণ বিধির মাধ্যমে প্রার্থীদের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কঠোরতা বৃদ্ধি করা, 'না' ভোটের সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিয়ে আসা ও নির্বাচন কমিশনের নতুন নিয়োগ বিধি জারি করা হয়, যার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায়।

তবে এসব ইতিবাচক পরিবর্তন সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের বেশ কিছু দুর্বলতা এখনো রয়ে গেছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়নি। এছাড়া বিদ্যমান আইনে নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন-পরবর্তী কতদিন পর্যন্ত এবং কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশনের অধীন থাকবে তা সুনির্দিষ্ট না থাকা, জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক না থাকা, নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের অযোগ্যতাজনিত সদস্যপদ বাতিলের ক্ষমতা না থাকা, প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, রাজনৈতিক দলের আর্থিক হিসাব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নির্দেশনা না থাকা, তফসিল ঘোষণার আগে নির্বাচনী প্রচারণাকে আচরণ বিধির অন্তর্ভুক্ত না করা, নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের শাস্তির ক্ষেত্রে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ও আচরণ বিধির মধ্যে অসামঞ্জস্যতা, এবং সংশোধিত সংবিধানের প্রেক্ষিতে নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র না থাকা (নির্বাচনী আইন ও আচরণ বিধিতে মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের প্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে উল্লেখ না থাকা) ইত্যাদি সীমাবদ্ধতা এখনো বিদ্যমান।

২.২ নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা

২.২.১ নির্বাচন আয়োজন: ২০০৮ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন আয়োজন করে, যার মধ্যে রয়েছে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (৩০০টি আসনে); জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন (১৬টি আসনে); জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন (৫০টি আসনে); রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (দুইবার); সিটি করপোরেশন নির্বাচন (১৩টি); পৌরসভা নির্বাচন (২৮৪টি); উপজেলা পরিষদ নির্বাচন (৪৮১টি); এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন (৪,৪৩১টি)। এসব নির্বাচন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সব মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। নির্বাচন কমিশন প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীল না থেকে পর্যায়ক্রমে নিজস্ব জনবল দিয়ে এসব নির্বাচন আয়োজন করে, যেখানে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচন পরিচালনা করেন।

তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোর ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে সরকার ও প্রশাসনের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতে হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলেও দুইটি সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও দ্বিতীয় দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কয়েকটি এলাকায় সহিংস ঘটনা ঘটে।

২.২.২ নির্বাচনী আচরণ বিধি ও তার প্রয়োগ: নির্বাচন কমিশন প্রতিটি স্তরে নির্বাচনের জন্য গুণগত কিছু পরিবর্তন এনে নির্বাচন-ভিত্তিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করে, যা মেনে চলার প্রবণতা প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে লক্ষ করা যায়। তবে তারপরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে আচরণ বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। আচরণ বিধি লঙ্ঘনের মধ্যে নির্বাচনী কাজে সরকারি সার্কিট হাউস ও গাড়ি ব্যবহার, রঙিন বিলবোর্ড ব্যবহার, রাস্তার ওপর জনসভা আয়োজন, নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে বেশি নির্বাচনী কার্যালয় স্থাপন, তোরণ নির্মাণ, প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার, ভোট কেনার অভিযোগ, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রার্থীকে দলীয়ভাবে সমর্থন ও অর্থের বিনিময়ে সমর্থন দেওয়া উল্লেখযোগ্য। কমিশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে কারণ-দর্শানো, জরিমানা ও সতর্কতা নোটিশ দেওয়া হয়। তবে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিটি করপোরেশন নির্বাচনগুলোতে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণে নির্বাচন কমিশনের সক্রিয়তার ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

২.২.৩ ভোটার তালিকা: নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নবম জাতীয় নির্বাচনের জন্য ছবিসহ নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন, যা পরবর্তীতে বর্তমান কমিশন হালনাগাদ করেছে। হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকায় প্রায় ১ কোটি ১১ লাখ নতুন ভোটার ছবিসহ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্তমান ভোটার ৯,২১,২৯,৮৫২ জন (পুরুষ ৪,৬২,০১,৮৭১; নারী ৪,৫৯,২৭,৯৮১)। তবে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজে কোনো কোনো এলাকায় অনিয়মের (যেমন প্রতি বাড়িতে না যাওয়া, হালনাগাদের কাজে দীর্ঘসূত্রতা) অভিযোগ পাওয়া যায়।

২.২.৪ নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ: নির্বাচন কমিশনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ২০০৮ সালে সংসদীয় এলাকার সীমানা নতুন করে নির্ধারণ, যা বর্তমান কমিশন ২০১৩ সালে আবার সম্পন্ন করেছে। উল্লেখ্য, আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকলেও এর আগে সর্বশেষ ১৯৮৩ সালে সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। ২০০৮ সালে ১৩৩টি সংসদীয় আসন গণশুনানির জন্য চিহ্নিত করা হয়, যার মধ্যে ৮৪টি আসনের পুনর্বিন্যাস করা হয়। এ বছর ৮৪টি সংসদীয় আসন গণশুনানির জন্য চিহ্নিত করা হয়, যার মধ্যে ৫৩টি আসনের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। তবে কয়েকটি নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে। এছাড়া আসনপ্রতি ভোটার সংখ্যায় বৈষম্য লক্ষ করা যায়, যেমন ২৪টি সংসদীয় আসনের ভোটার সংখ্যা চার লাখের ওপরে, এবং ১৪টি আসনের ভোটার সংখ্যা দুই লাখের নিচে।

২.২.৫ নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তি: নবম জাতীয় নির্বাচনের পর ১৯টি নির্বাচনী মামলার মধ্যে মাত্র চারটির নিষ্পত্তি হয়েছে। তথ্য গোপন করে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত পাঁচজন সদস্যের বিরুদ্ধে মামলার প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে তিনজনের সদস্যপদ বাতিল হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনের পর দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা প্রায় দুই হাজার, যার মধ্যে কেবল দুইটির নিষ্পত্তি হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

২.২.৬ প্রার্থী ও দলের হিসাব নিরীক্ষা ও তথ্য প্রকাশ: বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য এবং নির্বাচনের পর প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। নির্দিষ্ট সময়ে রিটার্ন জমা দেয়নি এমন ১৪৪ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা করে।[২] তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন জমা না দেওয়া প্রার্থীর সংখ্যা প্রকাশ করেনি কমিশন। রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মিতভাবে বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করে, তবে আইনে উল্লেখ না থাকায় এ সংক্রান্ত তথ্য কমিশন প্রকাশ করেনি।

২.৩ নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিশ্লেষণ

নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা পর্যালোচনা করে দেখা যায় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে কমিশনের সচিবালয়ের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এজন্য 'নির্বাচন কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধি, ২০০৯' জারি করা হয়, যার মাধ্যমে কমিশনের সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের পার্থক্য দূর করার জন্য একটি একীভূত কর্মী ব্যবস্থাপনা প্রচলন করা হয়। একটি সম্মিলিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে (মাঠ পর্যায়ের নয়জনসহ) ৬১ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়। ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ১৫৪টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ৫টি, তৃতীয় শ্রেণির ১৫১টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ১১৭টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়; মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় ৯টি পদ এবং জেলা পর্যায়ের ১৯টি পদকে উন্নীত করা হয়। এছাড়া ২০১২ এর জুন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ১৭৪ জন ও তৃতীয় শ্রেণির ৪০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তবে এখনো কমিশনে নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত জটিলতা বিদ্যমান। জ্যেষ্ঠতার তালিকা নিয়ে বিতর্কের কারণে পদোন্নতি নিয়ে মামলা করা হয়। উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার ৮৫টি পদের নিয়োগের বিপরীতে হাইকোর্টে মামলা থাকায় এসব পদে জনবল এখনো শূন্য।

নির্বাচন কমিশনের অবকাঠামোগত উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য, যদিও এখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমিশনের সমস্যা বিদ্যমান। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ভবনের জন্য ঢাকার আগারগাঁও-এ ২.৩৬ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ভোটার তালিকা সংরক্ষণ ও হালনাগাদের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে (নয়টি আঞ্চলিক, ৫৪টি জেলা ও ৩৮৩টি উপজেলা পর্যায়ে) সার্ভার স্টেশন নির্মাণ করার উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মধ্যে ৩৭০টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে সার্ভার স্টেশন ভবনের জন্য জমি অধিগ্রহণ/ হস্তান্তর/ বন্দোবস্ত কিংবা ব্যবহারে অনুমতি প্রদানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যায়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে তদন্ত পরিচালনা ও অফিস রক্ষণাবেক্ষণে বরাদ্দ অপ্রতুল।

নির্বাচনী ও দাপ্তরিক কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম), ওয়েব ক্যামেরা, এসএমএস প্রবর্তন, মাঠ পর্যায় ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ইন্ট্রানেট ব্যবহার, এবং বাংলা ওয়েবসাইট চালু। তবে কমিশনের ওয়েবসাইটে সব তথ্য পাওয়া যায় না, যেমন সাম্প্রতিক নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য, পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী আসনের ভোটারসংখ্যাসহ তালিকা, নির্বাচনী মামলা, কমিশন আয়োজিত সংলাপের সারাংশ, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সার্বিক তথ্য, কমিশন বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন, নির্বাচন কমিশনের আর্থিক প্রতিবেদন, ইত্যাদি।

সার্বিকভাবে বলা যায় নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে গৃহীত নির্বাচনী ও প্রাতিষ্ঠানিক আইনের সংস্কারের ফলে নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এসব সংস্কারের ফলে নির্বাচনী সংস্কৃতির একটি গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, যেখানে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি জবাবদিহি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে যার তদারকির দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের হাতে ন্যস্ত। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কমিশনের অধীনে নিয়ে আসার ফলে এটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও শক্তিশালী হয়েছে। এছাড়া প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে নির্বাচন কমিশনের কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের মধ্যে সমন্বয় বেড়েছে, এবং নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৪ নির্বাচন কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা পর্যালোচনা

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সরকার (তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচিত সরকার), রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী প্রত্যক্ষভাবে এবং গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজের সংগঠন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার পরোক্ষভাবে নির্বাচন কমিশনের কাজ নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে একদিকে যেমন আইন প্রণয়ন ও সংশোধন, প্রশাসনিক সহায়তা ইত্যাদির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা দেওয়া হয়, অন্যদিকে কমিশনের আইন সংস্কারের সুপারিশ

[২] ২০০৯ এর ৭ অক্টোবর পর্যন্ত।

আমলে না নেওয়া, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন না করা, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রশাসনিক প্রভাব ইত্যাদি কমিশনকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। নির্বাচনী মামলার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের শ্লথগতি একটি উদ্বেগের বিষয়।

কমিশনের কার্যক্রমে কয়েকটি রাজনৈতিক দল থেকে সহযোগিতার অভাব ছিল। নির্বাচন কমিশনকে এ সময়ে একটি প্রধান দলের আস্থা অর্জনে বেগ পেতে হয়। এই দলের পক্ষ থেকে কমিশনের অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়, এবং পরবর্তীতে দলটি কমিশনের সংলাপে অংশগ্রহণ করেনি। এছাড়া কয়েকটি দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে কমিশন পুনর্গঠন এবং নির্বাচন কমিশনারদের পদত্যাগ দাবি করা হয়।

গণমাধ্যমের ভূমিকা নির্বাচন কমিশনের জন্য যেমন সহায়ক ছিল, নির্বাচন কমিশনও তেমনি গণমাধ্যমের কাছে উন্মুক্ত ছিল। একইভাবে নির্বাচন কমিশনের সংস্কার, নির্বাচনী আইন সংস্কার, ও সার্বিকভাবে নির্বাচনী সংস্কৃতি পরিবর্তনে নাগরিক সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, যদিও কোনো কোনো সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক ওঠে।

২.৫ বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

গবেষণার পর্যবেক্ষণ থেকে নির্বাচন কমিশনের নিচের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা যায়।

২.৫.১ অগ্রগতি

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে কমিশনের অধীন নিয়ে আসা এবং আর্থিক স্বাধীনতা কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। একীভূত কর্মী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনবল ব্যবস্থাপনার সংস্কার আরেকটি অগ্রগতি। নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচন গ্রহণযোগ্যভাবে আয়োজন, নির্বাচন অনুষ্ঠানে নিজস্ব ও দক্ষ জনবল ব্যবহার ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে। তথ্য প্রকাশের ধারার সূচনা ও বিভিন্ন সংস্কার প্রক্রিয়ায় সব স্টেকহোল্ডারকে সম্পৃক্ত করাও অন্যতম অগ্রগতি।

নির্বাচন সংক্রান্ত অগ্রগতির মধ্যে নির্বাচনী আইন ও প্রক্রিয়া সংস্কার, এবং বাস্তবায়ন, ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সীমানা পুনর্নির্ধারণ, রাজনৈতিক দলের তদারকি কাঠামো প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য। নির্বাচনী সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে, যার নিদর্শন পাওয়া যায় প্রধান রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সাধারণভাবে আচরণ বিধি মেনে চলা এবং নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেওয়ার মাধ্যমে।

২.৫.২ চ্যালেঞ্জ

- **দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করা:** সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর প্রেক্ষিতে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ। সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন হলে মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের সম্ভাব্য প্রভাব রোধ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ, যেখানে কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রচারণায় মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার সাম্প্রতিক উদ্যোগ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। কমিশনের পর্যাপ্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও নির্বাচন পরিচালনায় প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীলতা অব্যাহত রয়েছে; দশম সংসদ নির্বাচনেও জেলা প্রশাসকদের রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনে সাম্প্রতিক বিতর্কিত রদবদল ও পদোন্নতির কারণে নির্বাচন পরিচালনায় প্রশাসনের ওপর দলীয় প্রভাবের আশংকা রয়েছে। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, নির্বাচনী প্রচারণায় কালোটাকা ও পেশীশক্তির প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং আচরণ বিধি লঙ্ঘন রোধে কমিশনের ভূমিকাও সবার জন্য সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ।
- **প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা বৃদ্ধি:** নির্বাচন কমিশনের কিছু বিতর্কিত কার্যক্রম ও উদ্যোগ, যেমন বিএনপি'র সাথে নেতৃত্ব নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্টকে (বিএনএফ) নিবন্ধন দেওয়ার প্রক্রিয়া[৩], নির্বাচনী প্রচারণায় মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগ, নির্বাচন কমিশনের প্রার্থিতা বাতিল সংক্রান্ত ধারা (৯১-ই) বাতিলের সুপারিশ, আচরণ বিধি লঙ্ঘনের শাস্তি কমানোর সুপারিশ, দশম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক ইত্যাদি নানাবিধ কারণে কমিশনের ওপর রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা বাড়ানো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এছাড়া সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ, নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন ও ইভিএম ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক প্রধান বিরোধী দলের আস্থা অর্জনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- **স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রভাব:** সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতা আরও শক্তিশালী হয়েছে, যা নিয়ন্ত্রণ করা কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এসব নির্বাচন আয়োজনে কমিশন সরকারের ওপর নির্ভরশীল (নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত, প্রশাসনিক সহায়তা)।

---

[৩] উল্লেখ্য, নিবন্ধনের জন্য আবেদন আহবানের প্রেক্ষিতে যে ৪১টি দল আবেদন করে তার মধ্যে প্রাথমিকভাবে বিএনএফ বিবেচিত হয়। বিএনএফ প্রতীক হিসেবে ধানের শীষ, গমের শীষ বা রজনীগন্ধার জন্য আবেদন করে, যা বিএনপি'র প্রতীক ধানের শীষের কাছাকাছি। তবে প্রতীকের তালিকায় গমের শীষ না থাকলেও এটি যোগ করার কথা ভাবছে বলে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ আগস্ট ২০১৩)।

- **আইনি সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ:** বিভিন্ন আইনি সংস্কারের জন্য সরকারের ওপর নির্ভর করতে হয় নির্বাচন কমিশনকে। ফলে বিভিন্ন আইনি সীমাবদ্ধতা, যেমন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সুনির্দিষ্ট আইন না থাকা, নির্বাচনের সময় সুনির্দিষ্ট কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা না থাকা, নির্বাচনী প্রচারণার আওতা ও শুরুর সময় নির্ধারিত না থাকা, নির্বাচনী ব্যয় নিরীক্ষা করার পদ্ধতি প্রচলন না থাকা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইনি সংস্কার কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- **আইন প্রয়োগে দৃঢ়তা প্রদর্শন:** নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নির্ধারিত সীমার বাইরে নির্বাচনী ব্যয় রোধ করা কমিশনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।
- **প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা:** প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্যে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং নির্বাচন কমিশনের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা উল্লেখযোগ্য। জনবল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করায় ব্যর্থতার কারণে কমিশনের পেশাগত দক্ষতা ও আন্তরিকতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সর্বোপরি, জনগণের আস্থা অর্জন করা নির্বাচন কমিশনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

৩. উপসংহার ও সুপারিশ

নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমকে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখলে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ - এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। নির্বাচন কমিশন নিজস্ব উদ্যোগের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জগুলো (সব রাজনৈতিক দলের আস্থা অর্জন, নির্বাচনী প্রস্তুতি, বিদ্যমান আইন প্রয়োগে দৃঢ়তার প্রমাণ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা) মোকাবেলা করতে পারলেও বাহ্যিক চ্যালেঞ্জগুলোর (যেমন নির্বাচনের সময় সরকার কাঠামো, নির্বাচনের সময় নির্ধারণ, আইনি সংস্কারে সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা, প্রশাসনিক প্রভাব) ওপর কমিশনের নিয়ন্ত্রণ নেই। সার্বিকভাবে বলা যায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এককভাবে তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

গবেষণার পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হল।

ক. নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

১. **সবগুলো রাজনৈতিক দলের আস্থা অর্জন:** সবগুলো রাজনৈতিক দলের আস্থা অর্জন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমে নিম্নে উল্লিখিত উদ্যোগের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে হবে।
   - নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা খর্ব হয় এমন কোনো বিতর্কিত উদ্যোগ না নেওয়া, বরং শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা;
   - দলীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে নির্বাচনী আইন ও বিধির প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
   - কমিশনের কার্যক্রমে সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা;
   - আচরণ বিধি সংশোধনের মাধ্যমে দশম সংসদ নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র তৈরির চেষ্টা করা।
২. **নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনের নিজস্ব জনবল ব্যবহার:** দশম সংসদ নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনের নিজস্ব জনবল ব্যবহার করতে হবে। রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে কমিশনের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দিতে হবে।
৩. **নির্বাচনকে আরও বেশি প্রযুক্তিনির্ভর করা:** ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন, ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরা, ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচনকে আরও বেশি প্রযুক্তিনির্ভর করতে হবে।
৪. **নির্বাচন কমিশনের নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা:** নির্বাচন কমিশনের যেসব কার্যক্রম নিয়মিতভাবে করার কথা, যেমন ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা, নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা ইত্যাদি আইন অনুসরণ করে অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কমিশন প্রণীত কৌশলগত পরিকল্পনা ও কর্ম-পরিকল্পনা বিবেচনায় নিয়ে, বিশেষকরে তার সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরিখে বর্তমান কমিশনের কৌশলপত্র ও কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে। একটি পঞ্চবার্ষিকী নির্বাচনী ক্যালেন্ডার তৈরি করে তা অনুসরণ করতে হবে।
৫. **তথ্য প্রকাশ:** বর্তমানে প্রকাশিত তথ্যের পাশাপাশি যেসব তথ্য নির্বাচন কমিশনকে প্রকাশ করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক দলের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী আসনের ভোটারসংখ্যাসহ তালিকা, নির্বাচনী মামলা সংক্রান্ত তথ্য, নির্বাচন কমিশনের আয়োজিত সংলাপের ফলাফল বা সারাংশ, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সার্বিক তথ্য, নির্বাচন কমিশন বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন, এবং নির্বাচন কমিশনের বিস্তারিত বাজেট, বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসহ সকল আর্থিক দলিল।

খ. সরকারের ভূমিকা

৬. **প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন:** প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ পদ্ধতি সৃষ্টির লক্ষ্যে সাংবিধানিক অঙ্গীকার অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতে হবে। এই আইনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের যোগ্যতা, তাদের নিয়োগের প্রক্রিয়া, সংখ্যা, অপসারণের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান থাকতে হবে। এই প্রক্রিয়া হতে হবে দলনিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং সবগুলো রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

৭. **আইনি সংস্কারঃ** নির্বাচনী আইনের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দূর করতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে:

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পদায়ন ও বদলির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করা;
- নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী তিনমাস পর্যন্ত নির্বাচনকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে (যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে) কমিশনের অধীনে রাখা;
- প্রার্থিতা বাতিল, সংসদ সদস্যপদ বাতিল, ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- স্থানীয় কমিটির মনোনয়নকৃত প্রার্থীদের মধ্য থেকেই মনোনয়ন দান বাধ্যতামূলক করা;
- সংশোধিত সংবিধানের আলোকে নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা;
- প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই অন্তর্ভুক্ত করা;
- রাজনৈতিক দলের আর্থিক বিবরণী প্রকাশ সংক্রান্ত ধারা অন্তর্ভুক্ত করা;
- আচরণ বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত শাস্তির ক্ষেত্রে আইনে সব ধরনের অসামঞ্জস্যতা দূর করা;
- নির্বাচনী ট্রাইবুনালের অধীনে অভিযোগ দায়ের করার পরবর্তী ছয়মাসের মধ্যে আপিলসহ অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা;
- রাজনৈতিক দল ও জাতীয় নির্বাচনে নারী, সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রযোজ্য আইন সংশোধনের মাধ্যমে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা;
- কমপক্ষে আগামী দুইটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'না' ভোটের পুনঃ প্রচলন করা।

গ. রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

৮. **সংসদ সদস্যদের আর্থিক তথ্য প্রকাশঃ** প্রতি বছর সংসদ সদস্যদের আর্থিক তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হবে, যা নির্বাচন কমিশন জনগণের জন্য প্রকাশ করবে।

৯. **রাজনৈতিক দলের আর্থিক তথ্য প্রকাশঃ** প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং দলের আয়, ব্যয় এবং সম্পদের হালনাগাদকৃত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

১০. **সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চাঃ** রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চা বাড়াতে হবে। গঠনমূলক সমালোচনাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে হবে। তৃণমূল থেকে মনোনীত এবং সৎ, জনগণ-সম্পৃক্ত, জনকল্যাণে নিয়োজিত, অসাম্প্রদায়িক, রাজনীতির অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে। দুর্নীতিপরায়ণ, কালো টাকার মালিক ও সন্ত্রাসীদের নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া যাবে না।

১১. **নির্দলীয় স্থানীয় সরকার নির্বাচনঃ** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনকে দলীয় প্রভাবের বাইরে রাখতে হবে।

ঘ. নাগরিক সংগঠনের ভূমিকা

১২. **নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণঃ** নাগরিক সংগঠন কর্তৃক প্রথাগত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি কমিশনের কার্যক্রম, নির্বাচনী অর্থায়ন এবং ব্যয় আইনানুগ ও স্বচ্ছ হচ্ছে কি না তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

ঙ. গণমাধ্যমের ভূমিকা

১৩. **নির্বাচনী তথ্য প্রকাশঃ** গণমাধ্যমকে নির্বাচনে প্রার্থীদের ব্যক্তিগত ও আর্থিক তথ্য, নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন, নির্বাচনী ব্যয় ইত্যাদি সংক্রান্ত গভীর অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

****

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

আকরাম, শম, দাস, সক ও মাহমুদ, ত ২০১২, 'রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়', শাহজাদা আকরাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় (তৃতীয় খণ্ড)*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা।

আকরাম, শম ও দাস, সক ২০১০, *নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা: প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার ওপর একটি পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা।

আখতার, মই ২০০৯, *অভিনব সরকার ব্যতিক্রমি নির্বাচন*, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, এপ্রিল ২০১১, *দ্বি-বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ২০১১ - ২০১৩*, ঢাকা।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, 'বর্তমান সরকারের বিগত তিন বছরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে অর্জন বিষয়ক প্রতিবেদন', ২৭ জুন ২০১২।

মজুমদার, বআ, ২০০৯, *গণতন্ত্র, নির্বাচন ও সুশাসন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

মজুমদার, বআ (সম্পাদিত), ২০০৮, *সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন*, সুজন- সুশাসনের জন্য নাগরিক, ঢাকা।

রহমান, মম ১৯৮৮, *বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন*, প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রুমানা, শ, আফরোজ, ফ, দাস, সক ও আকরাম, শম ২০১২, *সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা।

Akram, SM & Das, SK 2006, 'Bangladesh Election Commission', Transparency International Bangladesh, Dhaka.

Akram, SM, Das, SK & Mahmud, T 2010, *Political Financing in Bangladesh*, Transparency International Bangladesh, Dhaka.

Bangladesh Election Commission 2011, *Five-Year Strategic Plan 2011-2016*, Dhaka.

Eicher, P, Alam, Z & Eckstein, J 2010, *Elections in Bangladesh 2006-2009: Transforming Failure into Success*, UNDP, Dhaka.

Election Working Group 2013, 'Observation of the Election Commission Bangladesh (ECB) Voter Registration Process, Phase 4: October - December 2012', Dhaka.

Huda, ATMS 2013, 'Its meaning, attributes and limit: Independence of Bangladesh Election Commission', *The Daily Star*, 17 March.

Hussain, MS 2012, *Electoral Reform in Bangladesh 1972 - 2008*, Palok Publications, Dhaka.

Khan, AA 2013, 'Electoral Challenges in Bangladesh: The choice between the unpalatable and disastrous', *The Daily Star*, 17 March.

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

Asian Network for Free Elections (Anfrel) Foundation 2008, 'Preliminary Report: Bangladesh Election Observation Mission 2008'.

Election Working Group 2008, 'Bangladesh Ninth Parliamentary Election: Election Observation Report'.

International Republican Institute and USAID 2008, 'Exit Poll: Bangladesh Parliamentary Election'.

JANIPOP 2010, 'Election Observation Report on 117 Electoral Constituency Bhola-3'.

JANIPOP 2010, 'Election Observation Report on Chittagong City Corporation Elections'.

National Democratic Institute (NDI) 2008, Statement of The NDI Election Observer Delegation to Bangladesh's 2008 Parliamentary Elections.

Rupantar 2009, 'Report on 9th Parliament Election Observation'.

The Asia Foundation, Odhikar, International Foundation for Electoral Systems 2009, 'Election Violence Education and Resolution'.

WAVE Foundation 2009, 'Election Observation Report on Bangladesh Ninth Parliamentary Election'.